

দাদি-নানিদের স্কুল

মাহফুজুর রহমান মানিক



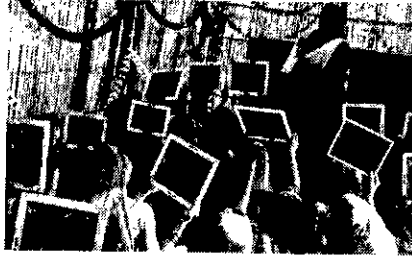
অন্যদৃষ্টি

শিক্ষার বয়স নেই। শিশুও প্রকৃতি থেকে শেখে। তবে শিশুর আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার বয়স আছে বটে। জার্মানিতে তো শিশুদের ৬ বছরের আগে বিদ্যালয়ে যাওয়াই নিষেধ। আমাদের এখানে অবশ্য অনেকে ৩ বছর থেকেই শিশুদের স্কুলে পাঠানো শুরু করেন। শিশুর ব্যাগও ভারী হয় তখন থেকেই। তা বন্ধে আদালতের রায়ও রয়েছে। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে এটা ঠিক, আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা যেন একটা বয়সের ফ্রেমে আবদ্ধ। ছোটবেলায় যারা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে, পরবর্তীকালে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে পড়াশোনায় ফিরতে পারে না। হয়তো বয়সে বাধা জয় করতে লজ্জা পায়। পারিপার্শ্বিক

নানা কারণও থাকতে পারে। তার পরও মাঝে মধ্যে আমরা দেখি 'বাবা-ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী'। কিংবা এ রকম বেশি বয়সে পড়ার প্রেরণাদায়ী নানা খবর সংবাদমাধ্যমের

কল্যাণে আমাদের কাছে আসে। প্রাসঙ্গিকভাবে ৮ মার্চ এবারের নারী দিবসে বিবিসির 'মিট দ্য গ্র্যানি' স গোয়িং টু স্কুল' শিরোনামের প্রতিবেদনটি প্রণিধানযোগ্য। সেখানে ভারতের দাদি-নানিদের একটি স্কুলের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। স্কুলটি দাদি-নানিদের জন্যই বটে। ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য, যেখানে নারীরা তুলনামূলক শিক্ষার সুযোগ কম পান। পরিসংখ্যান বলছে, সেখানে পুরুষ-নারীর সাক্ষরতার হার ৩ অনুপাত ১। সেখানেই এবারের নারী দিবসে স্কুলটির বয়স হয়েছে ১ বছর। মহারাষ্ট্রের ছোট একটি গ্রাম ফাংগানের দাদি-নানিদের স্কুলে ৯০ বছরের বৃদ্ধাও রয়েছেন। 'আজিবাঈফি শালা' নামের এ স্কুলটির মোট শিক্ষার্থী ২৯ জন নারী, যাদের বয়স ৬০-৯০ বছর। বয়সের কারণে অনেকে ঠিকমতো অক্ষরও দেখেন না। অনেকের নানা শারীরিক সমস্যার পরও তারা স্কুল কামাই দেন না। এতে তাদের উপকারই হয়েছে। এতদিন তারা অক্ষর চিনতেন না; স্কুলে আসার পর তারা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়েছেন। ৪১

বছর বয়সী যোগেন্দ্র বাংগাড় গ্রামের মানুষের সহযোগিতায় স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। সবার এগিয়ে আসার মাধ্যমে তা চলছে। স্কুলটির সফলতা এখানেই যে, এর মাধ্যমে একটা শ্রেণি সাক্ষরতা অর্জন করতে পারছে। যারা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নয়, তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। তাদের চোখ খুলে দেওয়ার চেয়ে মহৎ কাজ আর কী হতে পারে! এ স্কুলটি ঠিক সে কাজটিই করেছে। নিরক্ষরতার অভিশাপ ও অন্ধকার থেকে তারা এমন মানুষদের আলোতে আনতে সক্ষম হয়েছে, যারা হয়তো বিষয়টি স্বপ্নেও ভাবেনি। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বৃদ্ধরা শুয়ে-বসে সময় পার করেন। এ বয়সে নতুন করে পড়ার স্পৃহা অনেকে হারিয়ে ফেলেন। ঠিক এই সময়টায় তারা স্কুলে উপস্থিত হচ্ছেন, সবাই একত্রে উৎসাহের সঙ্গে পড়ছেন— এটা



ভালো বিষয়। বাংলাদেশেও নিরক্ষরতা বড় সমস্যা। সাম্প্রতিক জরিপ না থাকলেও সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশ। এ হিসাব ধরলেও ২৯ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর রয়েছে। আমাদের নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষরতার আলো প্রদানে আলোচ্য স্কুলটি প্রেরণা হতে পারে। এটি হয়তো ক্ষুদ্র উদ্যোগ, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা আশপাশের এলাকার বয়স্ক নিরক্ষর নারীরা উপকৃত হচ্ছেন। আমাদের দেশেও হয়তো কোথাও কোথাও সাক্ষরতার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ রয়েছে। এভাবে গ্রামে গ্রামে এমন স্কুল প্রতিষ্ঠা হলে তা নিঃসন্দেহে সাক্ষরতা আন্দোলনে বড় ভূমিকা পালন করবে। সুন্দর আগামী গড়ে তুলতে প্রতিটি মানুষের অক্ষরজ্ঞান আবশ্যিক। নারী-পুরুষ যারা লিখতে পারেন না, টিপসই দেন; তাদের কাছে নিজের হাতে লেখা নিজের নামটি নিশ্চয়ই পরম পাওয়া হবে। এ রকম উদ্যোগেই সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে পারে।

mahfuz.manik@gmail.com